মাছের রোগ, রোগের কারণ ও রোগ নিরাময় চিকিৎসা

ড. সুশান্ত কুমার পাল চৌধুরী

সূচনা

মাছ চাষ সফলতা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর। এদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাছের স্বাভাবিক খাদ্য যা জৈবিক ও অজৈবিক কারণের ওপর নির্ভরশীল। জীবিত প্রাণী কিংবা জীব মাত্রই রোগের আক্রান্ত হতে পারে। মাছের পরিবেশের মধ্যেই রয়েছে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণু ও রাক্ষুসে মাছের দল।

এরা কিন্তু সকলেই একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। নিশ্চয়ই রোগ জীবাণু মাছের ওপর আক্রমণের পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে পরিবেশেগুলো হলো- (১) মাছের পুষ্টির অভাব (২) দূষিত পানিতে হঠাৎ জীবাণু ও ভাইরাসের দ্রুত বংশবৃদ্ধি। মাছের দেহে হঠাৎ রোগের আক্রমণের ফলে অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রত্যেক্ষ করা যায়। এটি রোগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে থাকে; কিংবা কোনো আঘাতের ফলে ক্ষস্থানে ব্যাক্টেরিয়া জন্মানোর ফলে হতে পারে, বা ভাইরাসজনিক কারণে হতে পারে। আবার হঠাৎ জলজ পরিবেশ অবক্ষয়ের ফলে ভাইরাসজনিত কারণে মাছে রোগ হতে পারে। এই রোগের লক্ষণগুলো দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত হলো জলজ পরিবেশগত সমস্যা (খাদ্যের ঘাটতি, জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত এবং জলজ অন্যান্য চাপ সৃষ্টির ফলে) এবং মাছ যেহেতু শীতল রক্ত সমৃদ্ধে প্রাণী, সেহেতু মাছ তার দেহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অপারক। এই পরিবর্তনকে বেশিরভাগ এই বৈরী সমস্যাগুলো সার্বক্ষণিক শুধু চাষ ব্যবস্থাপনা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে নিরসন করা যায়। মাছের দেহে রোগের বিস্তার এবং রোগের উৎস ও রোগ সনাক্তকরণের মাধ্যমে পোষক ও জীবাণুর যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে এপিজ্যুটোলজী (Epizootology) আর এটিওলজী (Aetiology) বিদ্যা হলো রোগের কারণ হিসেবে সনাক্তকরণ তথ্য সংগ্রহ। Robertz (1978) বিজ্ঞানী এপিজ্যুটোলজী নামকরণটি প্রথম উল্লেখ করেন।

মাছের রোগ বিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Fish Pathology)

ফিশ প্যাথোলজীর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখা হলো Fish-মাছ, Pathos- মাছের রোগ এবং Logos = জ্ঞান। মাছের রোগ বিদ্যা সম্বন্ধনীয় বিজ্ঞান ফিশারীজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যাতে মাছের রোগ সনাক্তকরণ, রোগের লক্ষণ/কারণ, প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা এবং যোগিক ও রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হয়। এটি মৎস্য বিজ্ঞানের সুষ্ঠ মাছ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

মাছের পরজীবী সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Fish Parasitology)

প্যারাসাইটোলজী একটি ল্যাটিক শব্দ। এর ব্যাখ্যা হলো:

পার্শ্বে, sitos খাদ্য এবং logos জ্ঞান। মৎস্য পরজীবী সম্পর্কিত বিজ্ঞান, মৎস্য বিদ্যা বা ফিশারীজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং এই শাখায় মাছের পরজীবীর সাথে পোষকের ইতিবাচক-নেতিবাচক সম্পর্ক, পরজীবীর আবসস্থল, স্বভাব/আচরণ, এদের গাঠনিক বৈচিত্র্য, জীবনচক্র, প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমেই জ্ঞান দেওয়া হয়।

মৎস্য রোগ বিদ্যা ও পরজীবী বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য

মৎস্য রোগ বিদ্যা	মৎস্য পরজীবী
এটি মাছের রোগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও মৎস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।	এটি মাছের পরজীবী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও মৎস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।
মাছের রোগ সম্বন্ধীয় পূর্ণাঙ্গ বিষয় আলোচনা করা হয়।	মাছের পরজীবী সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য আলোচনা করা হয়।
মাছের বিভিন্ন রোগের কারণ/লক্ষণ / পর্যালোচনা ও রোগ সনাক্তকরণ করা হয়।	এ শাখায় পরজীবীদের প্রজাতি সনাক্তকরণ করা হয় এবং কোন মাছের সাথে এদের সম্পৃক্ততা ও পরিচিতি (জীবন বৃত্তান্ত) এ বিষয়ে জানা যায়।
এতে রোগ জীবাণু কর্তৃক মাছের সংক্রমণের ব্যাপকতা নির্ধারণ করা হয় ও রোগ নিরাময়ের কৌশল পর্যালোচনা করা হয়।	এতে পরজীবী কোন প্রজাতি) কর্তৃক সংক্রমণের সময়কাল এবং পরজীবীর উৎস সনাক্তকরণ করা হয়।
এতে মাছ ও রোগ জীবাণুর আন্তঃক্রিয়া আলোচনা হয়।	এতে পরজীবীরা কোন উৎস হতে মাছ আক্রান্ত করে তা সনাক্তকরণ করা হয়।
এতে রোগের প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে উন্নতি সাধন করা হয়।	এতে মাছের পরজীবী বিষয়ে প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

প্যাথোজেন বা রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব

পরজীবী (Parasite)	রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (Pathogen)
পরজীবী প্রাণী পোষকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ এবং দেহ থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে।	রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু (Pathogen) বা পরজীবী পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
পরজীবী পোষকের ত্বক, ফুলকা, পাখনা, ইত্যাদি অঙ্গে ক্ষতি সাধন ছাড়াও অভ্যন্তরীণ ক্ষতি করে।	রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বিশেষ অভ্যন্তরীণ অঙ্গে আক্রান্ত করে জীবের ক্ষতি সাধন করে থাকে।
পরজীবী জীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে।	রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী জীবাণু রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।
পরজীবী পোষকের ওপর নির্ভরশীল।	রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু পোষক ও পরজীবী উভয় উভয়ের ওপর নির্ভরশীল।
পরজীবী হঠাৎ পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি করে না। কিছু কিছু পরজীবীর জীবনচক্র দীর্ঘয়িত বিধায় পোষকের দেহে রোগ সক্রমণ ধীরে ধীরে ঘটে।	পরজীবী বা জীবাণু অতি অল্প সময়ে রোগ সৃষ্টি করে।

যেসব ক্ষুদ্র অণুজীব পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে প্যাথোজেন বা রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব বলে। যেমন আমাশয়ের জীবাণু বা অণুজীব *(Entamoeba histolytica)*.

মাছের রোগের উৎস ও ধরণসমূহ

জীবদেহে যে কোন জীবাণু/অণুজীবের আক্রমণে শরীরবৃত্তিয় কার্যাবলীর অস্বাভাবিক প্রকাশের মাধ্যমে জীবাণুগঠিত কিংবা পরজীবী গঠিত লক্ষণ দেখা দেয় তাকে রোগ বলে। আর জীবাণু যাতে রোগে আক্রান্ত হতে না পারে তাকে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা বলা হয়। রোগের উৎস অনুযায়ী রোগকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) অসংক্রমণ রোগ বা (Non Infections Disease).

(খ) সংক্রমণ রোগ বা (Infections Disease)

অসংক্রমণ রোগ

যেসব রোগ পরজীবী বা জীবাণুদ্বারা সংঘটিত না হয়ে কিংবা এক মাছ থেকে অন্য মাছে সংক্রমণ করে না তাকে অসংক্রমণ রোগ বলে। এসব রোগের বিভিন্নন কারণ হচ্ছে।

(১) পুষ্টিজনিক কারণ (২) বংশগতি সম্বন্ধীয় কারণ (৩) জলজ পরিবেশের দূষণ এবং অন্যান্য যেমন আলজেল ব্লুমের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা ও চর্বিজনিত শ্বাস রোগ।

অসংক্রমণ রোগের প্রধান উৎসগুলো হলো:

প্রাকৃতিক উৎস: তাপমাত্রার স্বল্পতা বা বৃদ্ধির প্রভাব।

- জলজ পরিবেশে বিভিন্ন পেরামিটারের অবক্ষয়।
- তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব।
- পুকুরে মাছের উদ্বৃত্ত খাদ্য পচে অসংক্রমণ রোগের বিস্তার।
- ভূমিক্ষয়জনিত তলানীর প্রভাব।
- জলাশয় বা নার্সারীতে অধিক ঘনত্বে পোনা পালনের ফলে সমআকৃতির পোনা উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।

রাসায়নিক উৎস

- ☐ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্বল্পতা
- ☐ পানিতে দ্রবীভূত গ্যাসের প্রভাব।
- ☐ পানিতে NH_4Cl, সায়ানাইড, ফসফরাস, সালফার, হ্যালোজেন, ইত্যাদির প্রভাব।
- ☐ দ্রবীভূত লবণের পরিমাণগত প্রভাব।

পুষ্টিজনিত উৎস

- ❑ খাদ্য গ্রহণেণ অনীহা, ফলে পুষ্টিজনিত অভাব
- ❑ বদহজম, কোষ্ঠকাঠিণ্য, সুষম খাদ্যের অভাব।

বংশগত উৎস

- ☞ বংশগত উৎসে পিতামাতার ক্রোমোজোমের ত্রুটি বা গ্যামেট সৃষ্টিকালে জীনগত সমস্যার কারণে বিকলাঙ্গ মাছ সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া অন্যান্য উৎসের মধ্যে নৌপথে জাহাজ/ডিজেল চালিত নৌকা থেকে জলাশয়ে ডিজেল নির্গমনের ফলে মাছ ও মাছের পোনায় দূষণজনিত কারণে অসংক্রমণ রোগ হতে পারে এবং বিভিন্ন তৈলাক্ত পদার্থ জলাশয়ে নির্গমনের ফলে মাছের বংশবিস্তার/জীবনচক্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

সংক্রমণ রোগের উৎস

প্রাকৃতিক পরিবেশে এক মাছ হতে অন্য মাছে অণুজীবাণু বা পরজীবী প্রাণী দ্বারা রোগ সংক্রমণ হয় বলে এদেরকে সংক্রামক রোগ বলা হয়ে থাকে।

মাছের রোগের লক্ষণসমূহ

পোনা অবস্থায় কিংবা দেহ বৃদ্ধি অবস্থায় মাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে। রোগাক্রান্ত মাছের **মাছে**

নিম্নেবর্ণিত লক্ষণ দ্বারা রোগ সনাক্তকরণ করা যায়।

- ❒ খাবার ট্রেতে মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ❒ বহিঃত্বকের রং ফ্যাকাশে, আঁশ উঠে যাওয়া, পাখনা খসে যাওয়া দেখে রোগ সনাক্তকরণ করা যায়।
- ❒ মাছের ফুলকায় কালো বর্ণ, বাদামী রং ধারণ করে, ফুলকা ফ্যাকাশে ও ছিঁড়ে যায়।
- ❒ রোগাক্রান্ত মাছের দেহে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে কিছুটা বসে যায়, কিন্তু সুস্থ মাছে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে বসে যায় না বরং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
- ❒ আঁশের এবং চোখের উজ্জ্বলতা দেখে সুস্থ ও টাটকা মাছ সনাক্ত করা যায়।
- ❒ চক্ষু ফ্যাকাশে ও ঘোলাটে দেখা যায়।
- ❒ লেজ নিচের দিকে হেলিয়ে পড়ে, লেজের পাখনা ছিঁড়ে যায়; লেজ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে মাছ ধীর গতিতে চলাচল করে।
- ❒ মাছের দেহে আঁশের নিচে লম্বা আঁচড় দেখা যায়।
- ❒ ভোরে মাছ অচেতন অবস্থায় পুকুরের কিনারা ঘেসে চলাফেরা করে।
- ❒ আকস্মিকভাবে পানির পরিবর্তন ঘটলে মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।
- ❒ পুকুরের আশেপাশে পচা ডিমের মতো গন্ধ পেলে মনে করতে হবে যে খামারের আশেপাশে পচা জৈব পদার্থ রয়েছে।
- ❒ পানির তাপমাত্রা ৩৬° এর উপরে গেলে, ভাসমান স্তর পড়লে বুঝতে হবে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ পানিতে আছে।
- ❒ পানির পিএইচ মাত্রা কম বেশি হলে মাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে।
- ❒ পানির স্বচ্ছতা কম বেশি হলে মাছের খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন দিক

আক্রান্ত অঙ্গে প্রদাহ (Inflamation)

যে কোনো কারণে মাছের অঙ্গে আঘাতের ফলে ঐ স্থান স্ফীত হয়ে প্রদাহ হতে পারে। এটি সাধারণত জলজ পরিবেশের বিভিন্ন চাপ কিংবা ভারসাম্যতার কারণে প্রদাহ হতে পারে। তবে আঘাতজনিত স্ফীত হওয়ার নিরাময় ব্যবস্থা রয়েছে। মাছ যেহেতু পয়কিলোথারমেল বা শীতল রক্ত সমৃদ্ধ প্রাণী সেহেতু দেহে এরা তাপমাত্রা জলজ পরিবেশের সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অঙ্গের প্রদাহ সনাক্তকরণের মূখ্য লক্ষ্যণীয় দিকগুলো হলো দেহে জ্বালা পোড়া, লালচে ভাব, ফুলে যাওয়া, কার্যক্ষমতা হ্রাস। মাছে বিভিন্নভাবে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। জীবাণু দ্বারা ত্বক আক্রান্ত হতে পারে। বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে মাছের ত্বক আক্রান্ত হতে পারে বা অত্যধিক আলোক রশ্মির কারণে ক্ষত হতে পারে। কিছু রক্তজালিকা হতে এমাইনেস (amines) ক্ষতিগ্রস্ত কোষ কলায় নির্গত হয়। ক্ষত বা স্ফীত হওয়ার ফলে-

(ক) কোপিলারিস বা কৈশিক নালীর প্রসারণ ঘটে।

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

(গ) কৈশিক নালীর অন্তআবরণীতে লিউমেন বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) সিরাম প্রোটিন, শ্বেত কণিকা, মনোসাইট এবং এম্বোসাইট পদার্থের পরিস্রবণ বা ক্ষরণ ঘটে, ফলে ক্ষরণ প্রদার্থ চুইয়ে ক্ষত এলাকায় পৌছে।

১। সিরাম প্রোটিন এন্টিবডি নির্গত করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। মনোসাইট মেক্রোফেইজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কোষ কলার রোগ উপাদান ভক্ষণ ও বর্জ্য কোষ কলা থেকে নিষ্কাশন করে। আবার সামান্য আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি হলে সামান্য চিকিৎসায় রোগ নিরাময় করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় রোগ সনাক্তকরণ এবং রোগের ব্যাপকতা অনুধাবন করে নির্ধারিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা। তবে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে নিরাময় করা সম্ভব হয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় তরল ঔষধ। এই তরল পদার্থ পোষকের ঘা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগৃহিত করা হয় এবং এতে রয়েছে লিউকোসাইড, মিউকাস, ফাইব্রিনোজেন, ফাইব্রিন বা পানি। মাংসপেশী কলায় পচন ধরলে কোষ কলার অভ্যন্তরে রস জমা হলে তা নিয়ন্ত্রণ করে। সম্ভব হয়ে উঠে না। কোষগুলো স্ফীত হতে থাকে এবং শেষের দানাগুলো লোপ পায়, পরবর্তীতে সাইটোপ্লাজম গহ্বর (hydropic) দ্বারা পূর্ণ হয়। অবশেষে কোষগুলো মারা যায়। নিম্নে কোষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনটি প্রধান পচনের ক্রিয়া উল্লেখ করা হলো। লাইসিস পণ্যের ন্যায় প্রকৃতিগতভাবে তরল প্রকৃতির। এনজাইম লিউকোসাইট থেকে (neutrophills) কিংবা জীবাণু থেকে (ব্যাক্টেরিয়ার বিষাক্ত পদার্থ) ইত্যাদি নির্গত হয়।

২। রক্ত সরবরাহ হ্রাসের ফলে প্রকৃতিগতভাবে রক্ত জমাট বাধে (ischaemis)। এখানে কোষগুলো তাদের বহিঃআবরণী থাকার ফলে সনাক্ত করা যায়, কিন্তু কোষের নিউক্লিয়াসের সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।

৩। ক্ষতস্থানে নিউক্লিয়াস সংকুচিত এবং কালচে (pyknosis) হয়ে যায় অথবা নিউক্লিয়ার আবরণী ভেঙ্গে যায়। বেসোফিল হ্রাস পাওয়ার ফলে হাইড্রোলাইসিস (nucleic) দেখা দেয়, ফলে নিউক্লিয়ার প্রোফাইলের (রূপরেখা) স্বাভাবিক চিত্রের

অস্পষ্টতা দেখা দেয়। যেমন কান্ডে আকৃতির বা ব্যাঙাচির ন্যায় ক্রোমোটিন স্ট্যান্ড প্রতীয়মান হয় (karyolysis) ।

রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সাড়া

রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সাধা মাছের জন্য একটি আদর্শ নিরাময় ব্যবস্থা যা বিভিন্ন চাপ থেকে মাছকে মুক্ত রাখে। এটি এন্টিজেন এন্টিবডি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। মাছের এন্টিবডি হলো সিরাম প্রোটিন (imminoglobulins) , এর কার্যকারিতা তিনটি ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। যথা (১) জমাট বাধা (agglutinating) তলানীকরণ এবং ভাইরাস প্রশমিতকরণ। জমাট বাধাকরণ এন্টিবডি কিছু কিছু এন্টিবডির উদ্দীপনার মাধ্যমে সৃষ্ট হয় (যথা: ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস এবং লোহিত কণিকা) এই এন্টিবডিগুলো এন্টিজেনের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে। বৃহদাকার আকৃতির জমাট বাধাকরণ বস্তুতে পরিণত হওয়ার ফলে কম বিষাক্ততা হয় এবং ভক্ষণের জন্য (phagocytosis) সহজে আক্রমণতা বৃদ্ধি পায়।

এন্টিবডি মাছে তলানীকরণ বিষয়টি ততোটা গুরুত্ব বহন করে না। তবে এটি বিদ্যমান থাকে দ্রবীভূত এন্টিজেনে তলানীরূপে যা সহজ পরীক্ষা দ্বারা সনাক্ত করা যায়। ভাইরাস প্রশমিতকরণ এন্টিবডি cling ভাইরাস উপাদানে থাকে যা অকার্যকর অবস্থায় থাকে। মাছে এন্টিবডি নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। নির্ধারিত মাছে তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে (তাপমাত্রা সহায়ক হারের নীচে) এন্টিবডি তৈরিতে কিংবা বাধাগ্রস্ত হয় বা দমিয়ে থাকে। কিছু কিছু আবার স্বভাবগত সমস্যার (মাছের লিঙ্গের হারে অসামঞ্জস্যতার ফলে মাছে ঘনত্ব বৃদ্ধির সময় "ফেরোমন" নির্গমন) কারণে এন্টিবডি তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়। ক্ষতস্থান শুকানো নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা যখন কম থাকে তখন ক্ষতস্থান দমন অবস্থায় থাকে। আবার তাপমাত্রা বহিঃস্তরে আবরণীতে ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য ততোটা প্রভাবিত করে না, এর সাথে অন্যান্য ক্ষতস্থান নিরাময়ের বিষয়গুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে।

কোষ কলার প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন

স্পষ্টত কিছু কিছু কোষ কলার শারীরবৃত্তিয়করণে পরিবর্তন ঘটে যা নিম্ন আলোকপাত করা হলো।

(১) স্পনজিওসিস (Spongiosis) অফ এপিডারমিস

এটি স্ফীত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মালফিজিয়ান স্তরের প্রতিটি কোষ কলা হতে আলাদা হয়ে যায়। একে ইন্টারসেলুলার এডিমা বলা হয়। এই অবস্থায় ত্বকে গভীর ক্ষতস্থান দৃশ্যমান হয়। অবশেষে সাইট্রোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের পচন ধরার ফলে বহিঃত্বকের কোষগুলি মারা যায়।

(২) হাইপার প্লাশিয়া (Hyperplasia)

হাইপার প্লাশিয়ার ফলে বহিঃত্বকে সর্বত্র পচন ধরে। এই পচনের কারণ হিসেবে কিছু কিছু রাসায়নিক দূষণের ফলে কিংবা হরমোন এবং ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ঘটে।

(৩) বহিঃত্বকে ঘা (Ulecration of epidermis)

এসিডারমিস তার ভিত্তি পর্দা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হিসেবে কিছু জীবাণু দায়ী। যেমন *Saprolegmia parasitica.*

(৪) ত্বক সংক্রমণ (Dermatitis)

বহিঃত্বক (Stratum spongioum) এবং নিম্নত্বক সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মধ্যবর্তী স্ট্রেট্রামে ক্ষীন রক্ত প্রবাহ ঘটে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ব্যাক্টেরিয়া জীবাণুর কারণে স্ফীত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। রক্ত প্রবাহ (পরিস্রাবণ) দৃশ্যমান হয়। চোয়ানো তরল পদার্থের ফোটাগুলোতে পচন বর্জ্য জীবাণু এবং আঁশ (fibrin) থাকে। এই ধরনের ক্ষতস্থান ফেটে গিয়ে সংক্রামক জীবাণু পানিতে নির্গত হয়। (furunculosis) এর মতো।

(৫) রক্তশূন্যতা (Anaemia)

রক্তশূন্যতার কারণ হিসেবে হেমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়, যার ফলে রক্তে অম্লজান প্রবাহ হ্রাস পায়। এই কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে জীবাণুঘটিত সমস্যা দেখা দেয়। ফলে জীবাণু হেমোপয়েটিক (Haemopoetic) বা বৃক্ক এবং প্লীহা (Spleen) শেষ কলায় আক্রান্ত হয় অথবা এই কোষ কলা কার্যকারিতা হারায় (Hypoplastic)

(৬) লিউকোমিয়া (Leucomia)

এর ফলে রক্তে নিউকোসাইট বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হিসেবে নিয়োপ্লাস্টিকের (Neoplastic) দায়ী করা হয়েছে।

(৭) নিয়োপ্লাশিয়া (Neplasia)

এটি মেলিগনেন্ট টিউমার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন

কারণেণ এই মেলিগন্টে টিউমার দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভাইরাস, বিষক্রিয়া এবং হরমোন জনিত কারণ। সাধারণত মাছে যে টিউমার দেখা দেয় তা হলো চামড়ায় পেপিলমা সৃষ্ট, মাছের মুখ গহ্বরে এবং ঠোঁটে কারসিনময় আক্রান্ত। থাইরয়েড এবং যকৃতে এডিমা, সংযোগ কলায় "ফাইব্রমা" (Feiomymoma) সৃষ্টি। রেখাঙ্কিত মাংসপেশীতে রেবডোমাইওমা (rhabdomyoma) তরুণাস্থিত কনড্রোমা (Condroma) অস্থিতে অস্টিওমা (Osteoma) এবং অন্যান্য মেলিগনেন্ট টিউমার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

(৮) ফুলকায় লেমিলার এডিমা (Lamelar oedema of gills)

রাসায়নিক দূষণ এবং উত্তেজনক কীটনাশকের (DDT, ভারী ধাতু, ফরমালিন, ইত্যাদি) নেতিবাচক প্রভাব লেমিনার এডিমা ঘটে। রোগ সনাক্তকরণ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, সেকেন্ডারী লেমিলার গোড়ায় কৈশিক নালীতে রক্ত প্রবাহের বৃদ্ধি ঘটে। এর ফলে ফুলকার বহিঃআবরণীগুলো আলাদা হয়ে যায়। পরবর্তীতে ফুলকরি বহিঃআবরণীর কোষগুলোতে পচন ধরে।

(৯) আন্ত্রিক নালীতে গ্রেনুলমা জীবাণু আক্রমণ (Visceral granuloma of gut)

(১০) সিরোসিস (Cirrhosis)

বিষাক্ত দ্রব্য যকৃতের মূল অংশ (Focal) বা ব্যাপক আকারে কোষে পচন ধরে। নিউক্লিয়াসের নিউক্লি (Nuclei) পাইকনটিক (pyknotic) ধারণ করে এবং সইটোপ্লাজমে কোষ গহ্বর সৃষ্টি হয়। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে মাছে সিরোসিস দেখা দেয় এবং এতে যকৃতের কোষ আক্রান্তের ফলে ব্যাপক পচন ধরে। এই পচন যকৃত কোষীয় (Hepatocellular) অংশে ব্যাপক আকারে ঘটে থাকে। পেরি-বাইলারী সংযোগ কলায় ফাইব্রোসিসে আক্রান্ত হয়। ভাইরাসের আক্রমণের ফলে অধিশ্রবণিক পচন (Necrosis) রোগে আক্রান্ত হয়।

(১১) গ্লোমেরুলো নেফরাইটিস (Glomerulonephrites) রোগে আক্রান্ত

মূত্রনালীতে ব্যাক্টেরিয়েল এবং পরজীবীজনিত আক্রমণের ফলে শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন বেশির ভাগ মাছে দেখা দেয়। (Bowmans Capsule, Glomerular tuft এবং Glomerular basement membrane) চওড়া হয়ে উঠে। ফলে ফাইব্রসিস দেখা দেয়।

(১২) মাছের কানে Whirling রোগের পচন

সামুদ্রিক মাছে দূষণের ফলে *Myxosoma cerebalis* জীবাণুর আক্রমণে মাছের কারণে অস্থি ও তরুণাস্থিতে পচন ধরে। ফলে মাছ চলাচলে ভারসাম্যতা হারায়।

(১৩) জীবাণুগত কারণে পার্শ্বীয় রেখার পরিবর্তন

বিভিন্ন ধরনের দূষণের (ভারী ধাতু, কীটনাশক, গুড়া সাবান, হাইড্রোকার্বন, ইত্যাদি) কারণে মাছের সংবেদনশীল পার্শ্ববর্তী রেখায় শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তনের ফলে এডিমা, স্পসডিওসিস, নেকরোসিস, হাইরোসিস, হাইপার এবং মেটাপ্লাশিয়া রোগ দেখা দেয়।

(১৪) চোখের ছাউনি (cataract of the eye)

এই রোগ চাষকৃত খামারে *Dipiostomum spathecum* পরজীবী প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। মাছ চলাচলে ঝাপসা দেখে ফলে অন্যান্য মৎস্যভূক প্রাণী সহজে আক্রমণ করে।

(১৫) মাংসপেশীতে সংক্রমণ

মাছের বহিঃত্বকের নিচে মাংসপেশী পরজীবী প্রাণীর জন্যে সহায়ক স্থান। তাই মাংসপেশীতে বিভিন্ন পরজীবী ও ব্যাক্টেরিয়া প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ক্রাস্টেসিয়ান জাতীয় পরজীবী (Lernea) মাছের মাংসপেশীতে তরল পিচ্ছল পদার্থ নির্গমন করে পচন সৃষ্টি করে। *Cryptocotyle* পরজীবীর জীবন চক্রের *Metaceracrian* লার্ভেল ধাপে Fibrosis রোগ সৃষ্টি করে।

চলবে.....

প্রফেসর ড. সুশান্ত কুমার পাল চৌধুরী
সাবেক সদস্য পরিচালক (মৎস্য)
বিএআরসি, কৃষি মন্ত্রণালয়
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।